সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

শৈলশেখর মিত্র সম্পাদিত

# মজার মজার গল্প

পুনশ্চ

# আমাদের কথা

মজার গল্প পড়তে ছোট বড় সবাই ভালোবাসে—তাই সকলের কাছেই মজার গল্পের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। মজা কেবল হাসির গল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গল্পের বিষয়বস্তু ভৌতিক বা চোরের বা কল্পবিজ্ঞানের বা যা কিছুরই হোক না কেন—সে গল্প পড়ে যদি মজা পাওয়া যায় তবে তা মজার গল্প।

পত্রিকার কল্যাণেই সৃষ্টি হয় নতুন লেখক। যেমন 'সখা'-তেই হাতে-খড়ি হয়েছে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, ভুবনমোহন রায় (পরে 'সাথী'র সম্পাদক), কুমারী কামিনী সেন (পরে কামিনী রায়), তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (স্বর্ণলতার লেখক), নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রভৃতি বহু লেখকের।

স্বল্পায়ু হলেও অতি প্রতিভাবান ব্যক্তি প্রমদাচরণ সেন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে 'সখা' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে নবযুগের সূচনা করেন তার স্রোত আজো বইছে—কখনো জোয়ারে, কখনো বা ভাটায়।

শুরুতে লেখকের অভাবে 'সখা'র প্রথম সংখ্যায় প্রমদাচরণ সেনকে একাই প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত সব কিছু লিখতে হয়েছিল। এমন কি টাইটেল পেজের ছবিও তাঁকেই আঁকতে হয়েছিল। প্রথম সংখ্যা 'সখা'র পাতা লেখা দিয়ে ভর্তি করার জন্যে সেদিন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্ধান প্রমদাচরণ সেন পান নি। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে কলেজের তরুণ ছাত্র লেখক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে সহকারী হিসাবে পেয়েছিলেন। ধীরে ধীরে কতই না লেখক এসেছেন!

এই সংকলনের বেশির ভাগ গল্পই কোন না কোন পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকা না থাকলে এসব গল্প হয়ত কোনদিনও লেখা বা ছাপা হত না।

বর্তমানে ছোটদের উপযুক্ত সাহিত্য পত্রিকার অভাব দেখা দেওয়ায় তরুণ লেখকদের ভালো গল্প সৃষ্টিতেও পড়েছে ভাটার টান। তাই বর্তমানের চেয়ে অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়েছে বেশি করে। সত্যিকথা বলতে কি সুকুমার রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, রবীন্দ্রলাল রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি মজার গল্পের লেখকদের শূন্য আসন এখনো শূন্যই রয়ে গেছে।

কোন সাহিত্য সংকলনই কখনো সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে না। কারণ সকলের পছন্দ এক রকম নয়, আর বাংলা শিশু-সাহিত্যে যত ভালো ভালো মজার গল্প বেরিয়েছে তার সবকটির খোঁজ পাওয়াও সম্ভবপর নয়। তাই বহু লেখকের বহু গল্পই সংকলনে স্থান পায়নি। এ ত্রুটি অনিচ্ছাকৃত।

এই সংকলনের ব্যাপারে যাঁরা আমাদের সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন অশোক সেন, ব্রাত্যব্রত বসু, দেবযানী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অশোককুমার মিত্র।

যোগাযোগের সূত্র জানা না থাকায় ইচ্ছা থাকলেও কয়েকজন লেখকের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া সম্ভব হয়নি।

যাদের জন্যে আমাদের এই প্রয়াস তারা যদি খুশি হয় তা হলে সব চাইতে খুশি হব আমরা।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
শৈলশেখর মিত্র

কলকাতা বইমেলা,
১৯৯৭

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ইচ্ছাপূরণ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ৯ |
| লাল সুতো আর নীল সুতো | উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী | ১৩ |
| রামভজনের ঘোড়া কেনা | দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু | ১৫ |
| কাজির বুদ্ধি | প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় | ১৭ |
| লালু | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ২১ |
| ধনুমামার হাসি | পরশুরাম | ২৪ |
| প্রোফেশর জ্ঞানশঙ্কর | সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় | ২৯ |
| ডাকাত নাকি? | সুকুমার রায় | ৩২ |
| পারম্পর্য্য | মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় | ৩৩ |
| প্রাইভেট ডিটেকটিভ | হেমেন্দ্রকুমার রায় | ৩৫ |
| একপাটি জুতো | সুবিনয় রায় | ৪০ |
| ভারত-উদ্ধার ও পাঁঠা | বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় | ৪১ |
| নীতি বটিকা | খগেন্দ্রনাথ মিত্র | ৪৫ |
| ঘুড়ির সুতো | মণীন্দ্রলাল বসু | ৪৯ |
| চেনা অচেনা | পরিমল গোস্বামী | ৫২ |
| বেয়াই-পরিচয় | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৫৪ |
| হাসির গল্প | তুষারকান্তি ঘোষ | ৫৮ |
| নাথুনির মা | বনফুল | ৫৯ |
| গাধার কান | শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় | ৬০ |
| আজব প্রতিশোধ | সুনির্মল বসু | ৬৪ |
| লটারি | জরাসন্ধ | ৬৬ |
| কবি-সম্বর্ধনা | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৬৯ |

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ট্রেন দুর্ঘটনা | শিবরাম চক্রবর্তী | ৭৩ |
| একটি গোপনীয় কথা | মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য | ৭৬ |
| দিন হয়ে যায় রাত | রবীন্দ্রলাল রায় | ৮০ |
| পতিতপাবনের প্রতিভা | প্রেমেন্দ্র মিত্র | ৮৪ |
| Shoe-শিক্ষা | বুদ্ধদেব বসু | ৮৭ |
| নাদু মামার প্রতিশোধ | গজেন্দ্রকুমার মিত্র | ৯১ |
| জগাপিসি | প্রভাতকিরণ বসু | ৯৩ |
| গন্‌শার চিঠি | লীলা মজুমদার | ৯৫ |
| কর্তার বাড়ীর যাত্রা | মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় | ৯৭ |
| সমঝদার | আশাপূর্ণা দেবী | ৯৯ |
| ভিড়ের দাওয়াই | শৈল চক্রবর্তী | ১০৩ |
| গোবি মরুভূমিতে সিংখুড়ো | বিমল দত্ত | ১০৬ |
| বংশধর | নন্দগোপাল সেনগুপ্ত | ১১০ |
| রসগোল্লা পর্ব | বিমল মিত্র | ১১২ |
| ইচ্ছা মৃত্যু | কুমারেশ ঘোষ | ১১৫ |
| হাবুলবাবুর কাবুল যাত্রা | কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় | ১১৭ |
| হারপুন | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | ১১৯ |
| স্পটলাইট | সত্যজিৎ রায় | ১২৫ |
| গল্পের আড্ডায় রামখুড়ো | হিমানীশ গোস্বামী | ১৩১ |
| অনাদি মামা | সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ | ১৩৬ |
| বড়মামার পাঁচালী | পূর্ণেন্দু পত্রী | ১৪০ |
| খাওয়া-দাওয়ার গল্প | প্রফুল্ল রায় | ১৪৩ |
| দাদুর ইঁদুর | সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় | ১৪৭ |
| ভুসুক পণ্ডিত | শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় | ১৪৯ |
| ছোটমাসিদের বেড়াল | সুনীল জানা | ১৫১ |
| কেউ জানে না | শৈলশেখর মিত্র | ১৫৫ |
| ঝুনুমাসির বিড়াল | সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় | ১৫৭ |

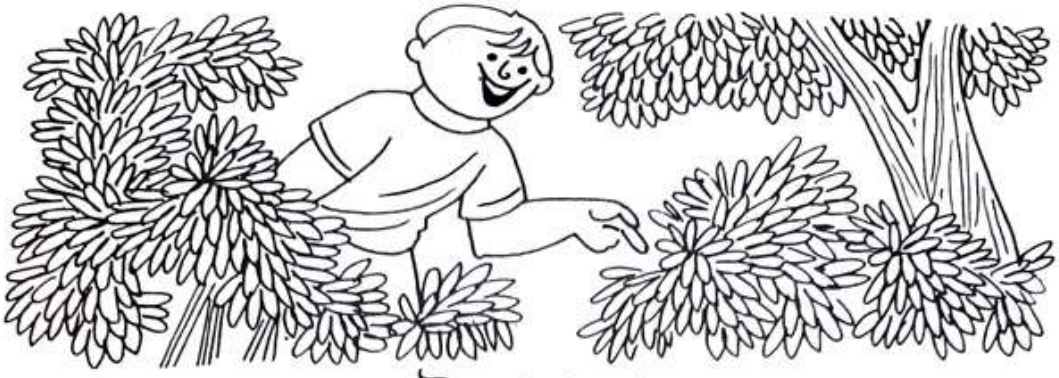

# ইচ্ছাপূরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৮৬১-১৯৪১)

সুবলচন্দ্রের ছেলেটির নাম সুশীলচন্দ্র। কিন্তু সকল সময়ে নামের মতো মানুষটি হয় না। সেই জন্যই সুবলচন্দ্র কিছু দুর্বল ছিলেন এবং সুশীলচন্দ্র বড়ো শান্ত ছিলেন না।

ছেলেটি পাড়াসুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া বেড়াইত, সেইজন্য বাপ মাঝে মাঝে শাসন করিতে ছুটিতেন; কিন্তু বাপের পায়ে ছিল বাত, আর ছেলেটি হরিণের মতো দৌড়িতে পারিত; কাজেই কিল চড় চাপড় সকল সময় ঠিক জায়গায় গিয়া পড়িত না। কিন্তু সুশীলচন্দ্র দৈবাত যেদিন ধরা পড়িতেন সেদিন তাঁহার আর রক্ষা থাকিত না।

আজ শনিবারের দিনে দুটোর সময় স্কুলের ছুটি ছিল, কিন্তু আজ স্কুলে যাইতে সুশীলের কিছুতেই মন উঠিতে ছিল না। তাহার অনেক গুলো কারণ ছিল। একে তো আজ স্কুলে ভূগোলের পরীক্ষা, তাহাতে আবার ও পাড়ার বোসেদের বাড়ি আজ সন্ধ্যার সময় বাজি পোড়ানো হইবে। সকাল হইতে সেখানে ধূমধাম চলিতেছে। সুশীলের ইচ্ছা, সেইখানেই আজ দিনটা কাটাইয়া দেয়।

অনেক ভাবিয়া, শেষকালে স্কুলে যাইবার সময় বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার বাপ সুবল গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী রে, বিছানায় পড়ে আছিস যে! আজ ইস্কুলে যাবি নে?'

সুশীল বলিল, 'আমার পেট কামড়াচ্ছে, আজ আমি স্কুলে যেতে পারব না।'

সুবল তাহার মিথ্যা কথা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বলিলেন, রোসো, একে আজ জব্দ করতে হবে। এই বলিয়া কহিলেন, 'পেট কামড়াচ্ছে? তবে তোর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। বোসেদের বাড়ি বাজি দেখতে হরিকে একলাই পাঠিয়ে দেব এখন। তোর জন্যে আজ লজঞ্চুস কিনে রেখেছিলুম, সেও আজ খেয়ে কাজ নেই। তুই এখানে চুপ করে পড়ে থাক, আমি খানিকটা পাঁচন তৈরি করে নিয়ে আসি।'

এই বলিয়া তাহার ঘরে শিকল দিয়া সুবলচন্দ্র খুব তিতো পাঁচন তৈয়ার করিয়া আনিতে গেলেন। সুশীল মহা মুশকিলে পড়িয়া গেল। লজঞ্চুস সে যেমন ভালোবাসিত পাঁচন খাইতে হইলে তাহার তেমনি সর্বনাশ বোধ হইত। ও দিকে আবার বোসেদের বাড়ি যাইবার জন্য কাল রাত হইতে তাহার মন ছটফট করিতেছে, তাহাও বুঝি বন্ধ হইল।

সুবলবাবু যখন খুব বড়ো একবাটি পাঁচন লইয়া ঘরে ঢুকিলেন সুশীল বিছানা হইতে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল, 'আমার পেট কামড়ানো একেবারে সেরে গেছে, আমি আজ ইস্কুলে যাব।'

বাবা বলিলেন, 'না না, সে কাজ নেই, তুই পাঁচন খেয়ে এইখানে চুপচাপ শুয়ে থাক।' এই বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া পাঁচন খাওয়াইয়া ঘরে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সুশীল বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত দিন ধরিয়া কেবল মনে করিতে লাগিল যে, 'আঃ, যদি কালই আমার বাবার মতো বয়স হয়, আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি, আমাকে কেউ বদ্ধ করে রাখতে পারে না।'

তাহার বাপ সুবলচন্দ্র বাহিরে একলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, 'আমার বাপ মা আমাকে বড়ো বেশি আদর দিতেন বলেই তো আমার পড়াশুনো কিছু হল না। আহা, আবার যদি সেই ছেলেবেলা ফিরে পাই, তা হলে আর কিছুতেই সময় নষ্ট না করে কেবল পড়াশুনো করে নিই।'

ইচ্ছাঠাকরুন সেই সময় ঘরের বাহির দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বাপের ও ছেলের মনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'আচ্ছা ভালো, কিছুদিন ইহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াই দেখা যাক।

এই ভাবিয়া বাপকে গিয়া বলিলেন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কাল হইতে তুমি তোমার ছেলের বয়স পাইবে।' ছেলেকে গিয়া বলিলেন, 'সকাল হইতে তুমি তোমার বাপের বয়সী হইবে।' শুনিয়া দুইজনে ভারি খুশি হইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ সুবলচন্দ্র রাত্রে ভালো ঘুমাইতে পারিতেন না, ভোরের দিকটায় ঘুমাইতেন। কিন্তু আজ তাঁহার কী হইল, হঠাৎ খুব ভোরে উঠিয়া একেবারে লাফ দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, খুব ছোটো হইয়া গেছেন; পড়া দাঁত সবগুলি উঠিয়াছে; মুখের গোঁফদাড়ি সমস্ত কোথায় গেছে, তাহার আর চিহ্ন নাই। রাত্রে যে ধুতি এবং জামা পরিয়া শুইয়াছিলেন, সকালবেলায় তাহা এত ঢিলা হইয়া গেছে যে হাতের দুই আস্তিন প্রায় মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, জামার গলা বুক পর্যন্ত নামিয়াছে, ধুতির কোঁচাটা এতই লুটাইতেছে যে, পা ফেলিয়া চলাই দায়।

আমাদের সুশীলচন্দ্র অন্যদিন ভোরে উঠিয়া চারিদিকে দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ান, কিন্তু আজ তাহার ঘুম আর ভাঙে না; যখন তাহার বাপ সুবলচন্দ্রের চেঁচামেচিতে সে জাগিয়া উঠিল তখন দেখিল, কাপড়-চোপড়গুলো গায়ে এমনি আঁটিয়া গেছে যে, ছিঁড়িয়া ফাটিয়া কুটিকুটি হইবার জো হইয়াছে; শরীরটা সমস্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে; কাঁচা-পাকা গোঁফে-দাড়িতে অর্ধেকটা মুখ দেখাই যায় না; মাথায় একমাথা চুল ছিল, হাত দিয়া দেখে সামনে চুল নাই—পরিষ্কার টাক চকচক করিতেছে।

আজ সকালে সুশীলচন্দ্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেই চায় না। অনেকবার তুড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাই তুলিল; অনেকবার এপাশ ওপাশ করিল; শেষকালে বাপ সুবলচন্দ্রের গোলমালে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

দুইজনের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু ভারী মুশকিল বাধিয়া গেল। আগেই বলিয়াছি, সুশীলচন্দ্র মনে করিত যে, সে যদি তাহার বাবা সুবলচন্দ্রের মতো বড়ো এবং স্বাধীন হয়, তবে যেমন ইচ্ছা গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া, কাঁচা আম খাইয়া, পাখির বাচ্ছা পাড়িয়া, দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবে; যখন ইচ্ছা ঘরে আসিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইবে, কেহ বারণ করিবার থাকিবে না। কিন্তু আশ্চর্য এই, সেদিন সকালে উঠিয়া তাহার গাছে চড়িতে ইচ্ছাই হইল না। পানাপুকুরটা দেখিয়া তাহার মনে হইল, ইহাতে ঝাঁপ দিলেই আমার কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিবে। চুপচাপ করিয়া দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

একবার মনে হইল, খোলাধূলাগুলো একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়াটা ভালো হয়না, একবার চেষ্টা করিয়াই দেখা যাক। এই ভাবিয়া কাছে একটা আমড়া গাছ ছিল, সেইটাতে উঠিবার জন্য অনেক রকম চেষ্টা করিল। কাল যে গাছটায় কাঠবিড়ালির মতো তর তর করিয়া চড়িতে পারিত আজ বুড়ো শরীর লইয়া সে গাছে কিছুতেই উঠিতে পারিল না; নিচেকার একটা কচি ডাল ধরিবামাত্র সেটা তাহার শরীরের ভারে ভাঙিয়া গেল এবং বুড়ো সুশীল ধপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কাছে রাস্তা দিয়া লোক চলিতেছিল, তাহারা বুড়োকে ছেলেমানুষের মতো গাছে চড়িতে ও পড়িতে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। সুশীলচন্দ্র লজ্জায় মুখ নিচু করিয়া আবার সেই দাওয়ায় মাদুরে আসিয়া বসিল; চাকরকে বলিল, 'ওরে বাজার থেকে এক টাকার লজঞ্চুস কিনে আন।'

লজঞ্চুসের প্রতি সুশীলচন্দ্রের বড়ো লোভ ছিল। স্কুলের ধারে দোকানে সে রোজ নানারঙের লজঞ্চুস সাজানো দেখিত; দু-চার পয়সা যাহা পাইত তাহাতেই লজঞ্চুস কিনিয়া খাইত; মনে করিত যখন বাবার মতো টাকা হইবে তখন কেবল পকেট ভরিয়া ভরিয়া লজঞ্চুস কিনিবে এবং খাইবে। আজ চাকর এক টাকায় একরাশ লজঞ্চুস কিনিয়া আনিয়া দিল; তাহারই একটা লইয়া সে দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিয়া চুষিতে লাগিল; কিন্তু বুড়োর মুখে ছেলেমানুষের লজঞ্চুস কিছুতেই ভালো লাগিল না। একবার ভাবিল,

এগুলো আমার ছেলেমানুষ বাবাকে খাইতে দেওয়া যাক; আবার তখনি মনে হইল, না কাজ নাই, এত লজঞ্চুস খাইলে উহার আবার অসুখ করিবে।

কাল পর্যন্ত যে সকল ছেলে সুশীলচন্দ্রের সঙ্গে কপাটি খেলিয়াছে আজ তাহারা সুশীলের সন্ধানে আসিয়া বুড়ো সুশীলকে দেখিয়া দূরে ছুটিয়া গেল।

সুশীল ভাবিয়াছিল, বাপের মতো স্বাধীন হইয়া তাহার সমস্ত ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে সমস্ত দিন ধরিয়া কেবলই ডুডু-ডুডু শব্দে কপাটি খেলিয়া বেড়াইবে; কিন্তু আজ রাখাল, গোপাল, অক্ষয়, নিবারণ, হরিশ এবং নন্দকে দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল, ভাবিল, চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি, এখনি বুঝি ছোঁড়াগুলি গোলমাল বাঁধাইয়া দিবে।

আগেই বলিয়াছি, বাবা সুবলচন্দ্র প্রতিদিন দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেন, যখন ছোট ছিলাম তখন দুষ্টামি করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইলে সমস্তদিন শান্তশিষ্ট হইয়া ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া কেবলই বই লইয়া পড়া মুখস্ত করি। এমন-কি সন্ধ্যার পরে ঠাকুরমার কাছে গল্প শোনা বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত পড়া তৈয়ারি করি।

কিন্তু ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইয়া সুবলচন্দ্রের কিছুতেই স্কুলমুখো হইতে চাহেন না। সুশীল বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিত, 'বাবা, ইস্কুলে যাবে না?' সুবল মাথা চুলকাইয়া মুখ নিচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিতেন, 'আজ আমার পেট কামড়াচ্ছে, আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।' সুশীল রাগ করিয়া বলিত, 'পারবে না বৈকি! ইস্কুলে যাবার সময় আমারও অমন ঢের পেট কামড়েছে, আমি ও সব জানি।'

বাস্তবিক সুশীল এতরকম উপায়ে স্কুল পলাইত এবং সে এত অল্পদিনের কথা যে, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া তাহার বাপের কর্ম নহে। সুশীল জোর করিয়া ক্ষুদ্র বাপটিকে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। স্কুলের ছুটির পর সুবল বাড়ি আসিয়া খুব একচোট ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন; কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে বৃদ্ধ সুশীলচন্দ্র চোখে চশমা দিয়া একখানা কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়া সুর করিয়া করিয়া পড়িত, সুবলের ছুটাছুটি গোলমালে তাহার পড়ার ব্যাঘাত হইত। তাই সে জোর করিয়া সুবলকে ধরিয়া সম্মুখে বসাইয়া হাতে একখানা শ্লেট দিয়া আঁক কষিতে দিত। আঁকগুলো এমনি বড়ো বড়ো বাছিয়া দিত যে, তাহার একটা কষিতেই তাহার বাপের একঘণ্টা চলিয়া যাইত। সন্ধ্যাবেলায় বুড়ো সুশীলের ঘরে অনেক বুড়োর মিলিয়া দাবা খেলিত। সে সময়টায় সুবলকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য সুশীল একজন মাস্টার রাখিয়া দিল; মাস্টার রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাহাকে পড়াইত।

খাওয়ার বিষয়ে সুশীলের বড়ো কড়াকড় ছিল। কারণ তাহার বাপ সুবল যখন বৃদ্ধ ছিলেন তখন তাঁহার খাওয়া ভালো হজম হইত না, একটু বেশি খাইলেই অম্বল হইত—সুশীলের সে কথাটা বেশ মনে আছে, সেইজন্য সে তাহার বাপকে কিছুতেই অধিক খাইতে দিত না। কিন্তু হঠাৎ অল্প বয়স হইয়া আজকাল তাঁর এমনি ক্ষুধা হইয়াছে যে, নুড়ি হজম করিয়া ফেলিতে পারিতেন। সুশীল তাঁহাকে যতই অল্প খাইতে দিত পেটের জ্বালায় ততই তিনি অস্থির হইয়া বেড়াইতেন। শেষকালে রোগা হইয়া শুকাইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গের হাড় বাহির হইয়া পড়িল। সুশীল ভাবিল, শক্ত ব্যামো হইয়াছে, তাই কেবলই ঔষধ গিলাইতে লাগিল।

বুড়ো সুশীলের বড়ো গোল বাধিল। সে তাহার পূর্বকালের অভ্যাসমত যাহা করে তাহাই তাহার সহ্য হয় না; পূর্বে সে পাড়ায় কোথাও যাত্রাগানের খবর পাইলেই বাড়ি হইতে পালাইয়া হিমে হোক, বৃষ্টিতে হোক, সেখানে গিয়া হাজির হইত। আজিকার বুড়া সুশীল সেই কাজ করিতে গিয়া, সর্দি হইয়া, কাশি হইয়া, গায়ে মাথায় ব্যথা হইয়া তিন হপ্তা শয্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিল। চিরকাল সে পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়াছে, আজও তাহাই করিতে গিয়া হাতের গাঁটি, পায়ের গাঁটি ফুলিয়া বিষম বাত উপস্থিত হইল; তাহার চিকিৎসা করিতে ছয়মাস গেল। তাহার পর হইতে দুই দিন অন্তর গরম জলে স্নান করিত এবং সুবলকেও কিছুতেই পুকুরে স্নান করিতে দিত না। পূর্বেকার অভ্যাসমত, ভুলিয়া তক্তপোশ হইতে সে লাফ দিয়া নামিতে যায় আর হাড়গুলো টনটন ঝনঝন করিয়া উঠে। মুখের মধ্যে আস্ত পান পুরিয়াই হঠাৎ দেখে দাঁত নাই, পান চিবানো অসাধ্য। ভুলিয়া চিরুনি-ব্রুশ লইয়া মাথা আঁচড়াইতে গিয়া দেখে প্রায় সকল মাথাতেই টাক। এক-এক দিন হঠাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে তাহার বাপের বয়সী বুড়ো হইয়াছে এবং ভুলিয়া পূর্বের অভ্যাসমতো দুষ্টামি করিয়া পাড়ার বুড়ি আব্দি পিসির জলের কলসে ঠন করিয়া ঢিল ছুড়িয়া

মারিত। বুড়োমানুষের এই ছেলেমানুষি দেখিয়া লোকেরা তাহাকে মার মার করিয়া তাড়াইয়া যাইত, সেও লজ্জায় মুখ রাখিবার জায়গা পাইত না।

সুবলচন্দ্রও এক-একদিন দৈবাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে আজকাল ছেলেমানুষ হইয়াছে। আপনাকে পূর্বের মতো বুড়া মনে করিয়া যেখানে বুড়া মানুষেরা তাশ-পাশা খেলিতেছে সেইখানে গিয়া সে বসিত এবং বুড়োর মতো কথা বলিত, শুনিয়া সকলেই তাহাকে 'যা যা খেলা কর গে যা, জ্যাঠামি করতে হবে না' বলিয়া কান ধরিয়া বিদায় করিয়া দিত। হঠাৎ ভুলিয়া মাস্টারকে গিয়া বলিত, 'দাও তো, তামাকটা দাও তো, খেয়ে নিই।' শুনিয়া মাস্টার তাহাকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দিত। নাপিতকে গিয়া বলিত, 'ওরে বেজা, কদিন আমাকে কামাতে আসিস নি কেন।' নাপিত ভাবিত ছেলেটি খুব ঠাট্টা করিতে শিখিয়াছে। সে উত্তর দিত, 'আর বছর দশেক বাদে আসব এখন।' আবার এক-এক দিন তাহার পূর্বের অভ্যাসমত তাহার ছেলে সুশীলকে গিয়া মারিত। সুশীল ভারি রাগ করিয়া বলিত, 'পড়াশুনা করে তোমার এই বুদ্ধি হচ্ছে? একরত্তি ছেলে হয়ে বুড়োমানুষের গায়ে হাত তোল!' অমনি চারিদিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া কেহ কিল, কেহ চড়, কেহ গালি দিতে আরম্ভ করে।

তখন সুবল একান্তমনে প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, 'আহা, যদি আমি আমার ছেলে সুশীলের মতো বড়ো হই, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই।'

সুশীলও প্রতিদিন জোড়হাত করে বলে, 'হে দেবতা, আমার বাপের মতো আমাকে ছোট করিয়া দাও, মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াই। বাবা, যে রকম দুষ্টামি আরম্ভ করিয়াছেন উঁহাকে আর আমি সামলাইতে পারি না, সর্বদা ভাবিয়া অস্থির হইলাম।'

তখন ইচ্ছাঠাকরুন আসিয়া বলিলেন, 'কেমন তোমাদের শখ মিটিয়াছে?'

তাঁহারা দুইজনেই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'দোহাই ঠাকরুন, মিটিয়াছে। এখন আমরা যে যাহা ছিলাম আমাদিগকে তাহাই করিয়া দাও।'

ইচ্ছাঠাকরুন বলিলেন, 'আচ্ছা, কাল সকালে উঠিয়া তাহাই হইবে।'

পরদিন সকালে সুবল পূর্বের মতো বুড়ো হইয়া এবং সুশীল ছেলে হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। দুজনেরই মনে হইল যে, স্বপ্ন হইতে জাগিয়াছি। সুবল গলা ভার করিয়া বলিলেন, 'সুশীল, ব্যাকরণ মুখস্থ করবে না?'

সুশীল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, 'বাবা, আমার বই হারিয়ে গেছে।'

# লাল সুতো আর নীল সুতো

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
(১৮৬৩-১৯১৫)

এক জোলা একদিন তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'আমি পায়েস খাব, পায়েস রেঁধে দাও।' জোলার স্ত্রী বলিল, 'ঘরে কাঠ নেই, কাঠ এনে দাও, পায়েস রেঁধে দিচ্ছি।' জোলা কাঠ আনিতে গেল।

পথের ধারে একটা বড় আম গাছ ছিল, তাহার একটা শুকনো ডালের আগায় বসিয়া জোলা তাহারই গোড়ার দিকটা কাটিতেছে। তাহা দেখিয়া পথের লোক একজন ডাকিয়া বলিল, 'ওহে ও ডাল কেটো না, কাটলে পড়ে যাবে।' জোলা বিরক্ত হইয়া বলিল, 'তুমি গুনতে জানো নাকি? ও ডাল কাটলে প'ড়ে যাব, তা তুমি কি ক'রে জানলে? আমি পায়েস খাব না বুঝি!' পথের লোক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। আর, খানিক পরে জোলাও ডালসুদ্ধ পড়িয়া গেল।

গাছ হইতে পড়িয়াই জোলা ভাবিল, 'তাই ত! আমি যে প'ড়ে যাব, তা ও জানলে কি ক'রে? ও নিশ্চয় একটা কেউ হবে।' এই ভাবিয়া জোলা ছুটিয়া গিয়া সেই পথিকের পা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রভু, আপনি কে? আমি কবে মরব, সেটি আমাকে ব'লে দিন।' পথিক ভারি মুশকিলেই পড়িল। জোলার খুব বিশ্বাস হইয়াছে যে, এ পথিক সামান্য পথিক নয়; সুতরাং তাহার প্রশ্নের উত্তর না পাইলে তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতেছে না। শেষটা পথিক যখন দেখিল যে, একটা কিছু না বলিলে তাহার আর ঘরে যাওয়া হইতেছে না, তখন সে রাগিয়া বলিল, 'তোর পেটের ভিতর থেকে লাল সুতো আর নীল সুতো যখন বেরুবে, তখন তুই মরবি।' এই কথায় জোলা সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ি ফিরিল।

এখন হইতে জোলা ঠিক হইয়া বসিয়া আছে যে, লাল সূতা আর নীল সূতা বাহির হইলেই তাহার মৃত্যু। সুতরাং সে রোজ পরীক্ষা করিয়া দেখে, তাহা বাহির হইল কি না। এইরূপ পরীক্ষা করিতে গিয়া একদিন সত্য সত্যই তাহার কাপড়ে একখণ্ড লাল সূতা আর একখণ্ড নীল সূতা পাইল। আর, অমনি সে চিৎকার করিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'ওগো শিগ্গির এস, আমি মরে গিয়েছি—আমার লাল সুতো নীল সুতো বেরিয়েছে।' তাহার স্ত্রী আসিয়া দেখিল, সত্য সত্যই লাল সূতা আর নীল সূতা। তখন সে বেচারা কি করে, জোলাকে বিছানায় শোয়াইয়া কাপড় চাপা দিয়া সে কাঁদিতে বসিল। এর মধ্যে আর দু-চারজন জোলা বেড়াইতে আসিয়া দেখে যে, জোলার স্ত্রী কাঁদিতেছে। তারপর জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিল যে, লাল সূতা নীল সূতা পাওয়া গিয়াছে, তখন সকলে স্থির করিল যে, জোলা নিশ্চয় মরিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার সৎকারের চেষ্টা দেখিতে লাগিল।